আনন্দবাজার পত্রিকা

ভয় আছে, ভরসার হাত নেই

২৮.০১.২০২০

সাবির আহমেদ

পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ গত তিন মাস ধরে প্রতি দিন সকাল থেকে কিছু একটা খুঁজে চলেছেন। বয়সের ভার, সঙ্গে তিন দশকের বেশি ধরে ডায়াবিটিসের কারণে চোখে ঝাপসা দেখেন। বেশ কষ্ট করেই রোজকার খবরের কাগজ পড়েন। গত কয়েক মাস সংবাদ খুঁটিয়ে পড়তে পড়তে এক অজানা ভয় গ্রাস করে ফেলেছে। তন্ন তন্ন করে ঘরের সব পুরনো দস্তাবেজ এক দফা দেখা হয়ে গিয়েছে, ভঙ্গুর হলদে হয়ে যাওয়া দলিল পড়তে আতস কাচেরও সাহায্য নিচ্ছেন, কিন্তু কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছেন না।

বারো বছর আগে জন্মদিনের একটা বৈধতা এসেছে বৃদ্ধের। হজে যাবেন বলে পাসপোর্টের আবেদনের সময় এক হলফনামা করে নিজের একটা জন্মদিন ও বছরের একটা সরকারি মান্যতা পেয়েছেন। পুলিশের লোক পাসপোর্টের ভেরিফিকেশন করতে এসে কাগজপত্র দেখে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে, মিষ্টি খাওয়ার টাকা নিয়ে তবেই সদর্থক সিলমোহর দিয়েছিল। সে দিন বৃদ্ধ ভেবেছিলেন, এটা জীবনের জবরদস্ত একটা দস্তাবেজ। তিনি যে ভারতীয়, এতেই প্রমাণ হবে। কিন্তু প্রতি সন্ধ্যার টিভি দেখে শঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে।

আর এক বার হলুদ হয়ে যাওয়া কাগজ দেখতে গিয়ে ভিরমি খেলেন বৃদ্ধ। যে ক'টা কাগজ আছে, নিজের ও বাবার নাম মিলিয়ে প্রায় পঁচিশ রকমের বানান চোখে পড়ল। নামের বানান নিয়ে অধিকাংশ মুসলমানের অদ্ভুত অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা হয়। সে দিন সরকারি হাসপাতালে কী বকুনি খেলেন আমাদের এই বৃদ্ধ। শেখ সদরুদ্দিনকে 'সুবীরউদ্দিন' বলে বেশ কয়েক বার কর্কশ গলায় হাঁক পাড়ছিল বটে এক জন। কিন্তু শেখ সাহেব অন্যের নাম মনে করে আনমনে বসে ছিলেন, অনেক ক্ষণ অপেক্ষা পরে খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারেন, তাঁকে অনেক বার ডাকা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই সহকারীও বিনামূল্যে পরামর্শ দিলেন, 'আপনাকে চোখ নয়, কান দেখাতে হবে।'

ডাক্তারের সহকারীর বকা খেয়ে একটু অভিমান হলেও পর ক্ষণে বেশ সরস ভাবে কানে কানে বলেন, 'কবি হয়তো অন্য কিছু ভেবে লিখেছিলেন, "নামে কিবা আসে যায়?" কী যে এসে যায় এ বার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি ও ভয় পাচ্ছি। ভয় তো আগেও কয়েক বার পেয়েছি, তবে ভয়ের সঙ্গে অনেক ভরসার হাতও ছিল।'

শ্রোতা পেয়ে পুরনো দিনের গল্প জুড়ে দিলেন। 'শিয়ালদহ অঞ্চলে হাজি পাড়ায় হিন্দু মালিকের ছাপাখানাতেই থাকার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৬৪ সালের সে দিন শহর হঠাৎ করে শুনশান। মালিকের কাছে শুনলাম, শহরে দাঙ্গা শুরু হয়েছে। ভাত রান্না সবে শেষ। খাবার ছেড়ে কয়েক জন মিলে দেশের বাড়ি যাব বলে বেরিয়ে পড়লাম। বড় রাস্তায় দেখলাম সব শুনশান, বাস-ট্রাম বন্ধ। হাওড়া কী ভাবে পৌঁছব এই চিন্তায় যখন আল্লার নাম জপ করছি, দেখি এক শিখ ট্যাক্সিচালক আমাদের কাছে হাজির। জানতে চাইলেন, 'কঁহা জানা হ্যায়?' শিয়ালদহ থেকে ডান দিক দিয়ে ঘুরে বিধান সরণি হয়ে হাওড়া পৌঁছল আমাদের ট্যাক্সি। এক পয়সা অতিরিক্ত চাইলেন না, বরং জানতে চাইলেন এর পরের অংশের যাত্রার জন্য আমাদের হাতে টাকা আছে কি না।' গল্প বলে একটু থামলেন শেখ সাহেব। তার পর বললেন, 'ভাবুন, দাঙ্গার হাত থেকে বাঁচাতে, শিখ ট্যাক্সিচালক, হিন্দু পাড়ার মধ্যে দিয়ে দুই মুসলমান যাত্রীকে আপাত নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছে দিচ্ছেন।'

ভদ্রলোক বলতে থাকেন, 'আমাদের দেখে মুসলমান হিসেবে চেনা বেশ কঠিন। বিশেষ অনুষ্ঠান বা দূরে সফর করলে ধুতিই প্রধান পোশাক। দিন দশেক বাদে কলকাতায় ফিরে দেখি, হাজি পাড়ার ডেরায় রান্না করা ভাত তত দিনে পচে গিয়ে পোকার খাবার হয়ে উঠেছে। চৌষট্টির দাঙ্গার পর, দেশভাগের পরেও পূর্ববঙ্গের থেকে যাওয়া কিছু মুসলমান এই দেশ আর নিরাপদ নয় ভেবে পূর্ব পাকিস্তান চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু আমার জন্মের দেশ এই ভারতের বঙ্গদেশ, আবার ফিরে যাওয়ার দেশও। আমি কোথায় যাব?

‘তবে কলকাতায় পাড়া বদল করতে হল। যশোরের কাশেম মিয়াকে চলে যেতে হচ্ছে বেঁধে দেওয়া দিনে। কলুটোলা অঞ্চলে একটা ছোট ঘর দিয়ে গেল, বদলে তাকে দিলাম একটা কাশ্মীরি শাল। কলুটোলা অঞ্চলে এসে আর এক সমস্যা। একে উর্দু বলতে পারি না, তায় এক রঙের লুঙ্গি পরি, মাঝে মধ্যে আবার ধুতি। প্রতিবেশীদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন— কাশেম মিয়া কী তা হলে হিন্দুকে ঘর দিয়ে গেল? নিজের মুসলমান পরিচয় একটু জোরালো করতে বেশ কয়েক দিন ঘন ঘন মসজিদে যেতে হল, চেক লুঙ্গি পরতে শুরু করলাম। সময়ের কালে সব ভুলে গিয়ে জীবন একটা স্বাভাবিক ছন্দে চলতে শুরু করে। এক সঙ্গে বসবাস করলেও প্রতিবেশী হিসেবে যাঁদের সঙ্গে এক বারে সখ্য গড়ে উঠেনি, বিরানব্বইয়ের দাঙ্গার সময় সেই উর্দুভাষী মানুষদের অনেককেই দেখলাম, পাড়ার মন্দিরগুলোর যাতে না ক্ষতি হয়, সে জন্য রাত জাগলেন।’

কথাগুলো বলতে বলতে চোখের ডাক্তারের দেওয়া আই ড্রপ ও কান্নার জলে চোখ ছলছল করল তাঁর। ডাক্তারের সহকারী আবার একটা ভুল নামে বৃদ্ধকে ডাকলেন। চোখের এই অবস্থা দেখে ডাক্তার জানালেন, আজ আর দেখা যাবে না। বৃদ্ধ এ বার বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যাওয়ার আগে শুধু বলে গেলেন, ‘আর এক জমির পর্চার সন্ধান পেয়েছি। এই দলিলে আমার বাবার নাম আছে। এটাই পরিবারের সবচেয়ে প্রাচীন দলিল।’ একটা চাপা যন্ত্রণাকে হালকা করতে একটু হেসে বললেন, ‘তবে সে দলিল আবার ফারসি ভাষায় লেখা। এই দলিল দেখে অমিত শাহেরা আবার পারস্যে পাঠিয়ে দেবেন না তো?’

প্রতীচী ইনস্টিটিউট, কলকাতা